ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 143–153
www.athenajournalcbm.in

নারীচেতনা ও মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার ভুবন

ড. পীযূষ পোদ্দার*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ০৪.০৫.২০২৫ গৃহীত: ০৭.০৬.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *নারীর প্রজন্মবাহিত অবহেলার ইতিহাস অনুধাবন করে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত সমচেতনা থেকে নারী পরিসরের ঘর-বাহির বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর লেখনীতে। তাঁর কবিতাগুলিকে সমাজ-ইতিহাসের দলিল হিসাবেও পড়া যায়। মেরী ওলস্টোনক্রাফট, ভার্জিনিয়া উলফ, সিমোন দ্য বোভোয়ার প্রমুখের চর্চাকে অবলম্বন ও বিশ্লেষণ করেছেন মল্লিকা তাঁর প্রবন্ধে। কবিতার মধ্যে তিনি শুধু যে নারীর অধিকারের জন্য সরব হয়েছেন, বিষয়টি এমন নয়। বিভেদহীন মানুষের সমাজ তাঁর কাঙ্ক্ষিত। বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। সভ্যতার গড্ডলপ্রবাহে একরৈখিকভাবে যে নির্যাতন নারীদের সহ্য করতে হয়েছে মল্লিকা তার অবসান চেয়েছেন চিরদিনের জন্য। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা তাই নারীর মুক্তি ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে চেয়েছে বারবার।*

সূচক শব্দ: *নারী, অবহেলা, বিভেদ, ইতিহাস, সাম্য, সমানাধিকার, মুক্তি।*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: pijushpoddarkalyani@gmail.com

মূলপ্রবন্ধ:

সে অনেক, অনেক দিন আগের কথা। নদীঘেরা পঞ্চতন্ত্র গ্রামে বাস করত এক ব্রাহ্মণ, এক ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণীর কোল আলো করে সন্তান এল। ছেলে। 'ছেলে কিন্তু ছেলে নয়'। চোখের নিমেষে ছেলেটি রূপান্তরিত হলো কেউটে সাপে। আর ব্রাহ্মণী তাকেই পোষেন দুধকলা দিয়ে। ব্রাহ্মণীর যত্ন আত্তিতে সাপ একদিন বড়ো হলো। এক মানবীকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হলো। আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটল তারপরেই, তরুণী দেখল সাপের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক অপরূপ যুবক, মানুষের মতোই তার চোখ, মানুষের মতোই তার ভাষা। সে এসে চুমুতে ভরিয়ে দিল তরুণীর শরীর। আবেশ বিহ্বল রাত শেষে সে যুবক খোলসে ঢুকে আবার সাপ হয়ে গেল। আড়াল থেকে একদিন এই দৃশ্য দেখলেন ব্রাহ্মণ। একরাতে খোলস থেকে যুবক বেরিয়ে আসতেই ব্রাহ্মণ খোলস পুড়িয়ে দিলেন। খলতা, নীচতা পুড়ে শাপমুক্ত সতেজ যুবক মানুষ হয়ে গেল। আশ্চর্য রূপকথার আদলে এমন রূপকল্প নির্মাণ করেছেন কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'খোলস মানুষ'কবিতায় বিষাদ আর করুণ আর্তি দিয়ে মল্লিকা সমাপ্ত করেছেন কবিতার শেষ ছয় পঙ্‌ক্তি—

যেদিন আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখেন ব্রাহ্মণ
সাপের খোলস তিনি পুড়িয়ে দিলেন
খলতা নীচতা পুড়ে শাপমুক্ত যুবক সতেজ
কোথায় লুকিয়ে ছিলি মানুষের ছেলে এতদিন!
এখন তেমন সেই মানুষই-বা কোথায় খুঁজব
সমস্ত খোলস যিনি দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবেন!

(খোলস মানুষ/মেয়েদের অ আ ক খ)

দাউ দাউ খোলস জ্বালিয়ে মল্লিকার মানুষ খুঁজবার প্রেক্ষিতে আমরা দেখে নিতে চাই তার কবিতার ভুবন। নারীবাদী বলে, একবগ্গা বলে, তাকে দেগে দেবার রাজনীতিরও বিশ্লেষণ অনিবার্য, মল্লিকা সেনগুপ্ত কি নারীবাদী নাকি মুখোশহীন মানুষ তাঁর অন্বিষ্ট?

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects' গ্রন্থে প্রচলন সমাজ-ধর্ম-আইন সব কিছুর মধ্যে পুরুষের ভণ্ডামি ও নারীর প্রতি বিদ্বেষের কথা তুলে ধরেছিলেন।ফলশ্রুতিতে পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা মেরিকে 'পেটিকোট পরা হায়েনা'বলে তীব্র ব্যঙ্গে চরম নিন্দিত করার চেষ্টা করেছিল। তাঁদের চোখে মেরি নারীমূর্তির অশুভ প্রতীক হলেও আধুনিক নারীবাদ বা নারী-কেন্দ্রিক চিন্তনের জননী হলেন মেরি ওলস্টোন ক্র্যাফট। মেরির নারীকেন্দ্রিক চিন্তনের সার্থক উত্তরাধিকারী সিমোন দ্য বোভেয়ার। বোভেয়ারের 'ল্য দ্যজিয়েম সেক্স' (Le Deuxieme Sex) ইংরেজিতে 'The Second Sex' (১৯৫৩) নামে অনূদিত হবার পর সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়। বোভেয়ার ফরাসি নারীদের জীবন, অবস্থান, চিন্তন, স্বপ্ন, আনন্দ দুঃখ বিষাদকে যে দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর প্রেক্ষিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-দেশান্তরের সমাজে নারীদের অবস্থান চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। বোভেয়ার মনে করেন, প্রজননের মাধ্যমে কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, হয়ে উঠতে হয় সৃষ্টি ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ে পুরুষেরা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং নারীরা বঞ্চিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় কবিতা সিংহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন, গীতা চট্টোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, চৈতালী চট্টোপাধ্যায় পুরুষের এই আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্র উচ্চারণে সম অধিকারের কথা বলেছেন। বোভেয়ারের চিন্তনের যৌক্তিকতা শৃঙ্খলা এবং ইতিহাস, পুরাণ ও সমাজবিজ্ঞানের ভাষ্য প্রতিফলিত হয়েছে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায়। তীব্র চিৎকারে মল্লিকা গগন বিদীর্ণ করতে চাননি, বরং নম্র নিবেদনে আত্মপ্রতারক সমাজের ব্যাধিকে চিহ্নিত করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে

বলেছেন, মল্লিকার আরেকটি কৃতিত্ব এই, সে যখন নারীবাদী কবিতা লিখেছে, সেগুলি আগে কবিতা হয়ে উঠেছে তারপর এসেছে জোরালো বক্তব্য।[১] লিঙ্গ বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর কবিতাকে নারীবাদী বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস থাকলেও মল্লিকার নারীবাদ তো মানুষের কথা বলে, শ্রেণি নির্বিশেষে মুক্তি ও আনন্দের কথা বলে, তাঁর নিজের কথায়—ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে আমি তারই ভাষ্যকার। পুরুষতন্ত্রের মুখব্যাদান করা কৃষ্ণবিবরে মল্লিকার কবিতা তাই সভ্যতার অসুখের বিশল্যকরণী— কথামানবীর যাপিত জীবনের ভাষ্য। দখলদারির বিরুদ্ধে একরৈখিক লৈঙ্গিক আগ্রাসন ও চিন্তনের বিরুদ্ধে, পুরুষের ইচ্ছেবস্তু হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে মল্লিকা তার নানা কাব্যে-কবিতায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম কাব্য 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত দীর্ঘ পরিক্রমায় মল্লিকার ১৪-টি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে।এই দীর্ঘ পরিক্রমায় মল্লিকা যে কবিতাবিশ্ব সৃজন করেছেন তা সংস্কারমুক্ত পৃথিবীকে উভলিঙ্গের জন্য সমানাধিকারের কথা বলে। শুধু নারীসত্তার প্রতিষ্ঠা নয়। মল্লিকার কবিতা মানবশক্তির কথা বলে। কোকিলের ডাক নকল করে আমাদের মধুমাস পালন করা জীবনে মল্লিকার কবিতার অভিঘাত যে নতুন পরিসর নির্মাণ করে তাকে আমরা গ্রহণ করে উঠতে পারি না সব সময়। আধিপত্যবাদ দেশ দেশান্তরে সব দখল করে নিতে চায়, এই আধিপত্যবাদের, দখলদারিত্বের সবচেয়ে সহজ শিকার হয় নারী। সামাজিক অচলায়তনের নানাবিধ গণ্ডি তাকে ঘিরে থাকে। তবু ভূগোলের সীমায় নানা দেশের নানা ভূখণ্ডে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বিচ্ছিন্নভাবে শোনা যায়। এই স্বরকে চেপে দেওয়ায় দমন করার প্রয়াসও হয়েছে যথেষ্ট। আসলে পুরুষ আধিপত্যবাদের নিরোর বেহালা দেশ-দেশান্তরে কাল থেকে কালান্তরে বেজেই চলে। 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'কাব্যের 'নিরোর বেহালা' কবিতায় মল্লিকা আসলে ইতিহাসের এক অমোঘ কালো চক্রমণকে তুলে ধরলেন। সুখদ-বরদ-শুভদ চিন্তার সোনালি স্বপ্ন এক মায়া বিভ্রম। 'মল্লিকার মতো কবির কাছে কবিতা শুধুমাত্র শিল্পিত প্রকাশ নয়, তাদৃশ্য ও অদৃশ্য লৈঙ্গিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধেরও ঘোষণা'।[২] নারীবিশ্বে প্রতি মুহূর্তে জমা হতে থাকে রক্তাক্ত ঝরোখার সংবেদন, মল্লিকা এই সংবেদনকেই তুলে ধরেন কবিতার আখরে—

ক্রমশ নামছে রাত! ভাঙাচোরা। ভাঙাচোরা সিটের কানাচে
যে পাখিরা বাসা বেঁধে আছে তাদের কাতর ডাকে
মধ্যযাম শিউরিয়ে ওঠে, তার চোখের আড়ালে
কী যেন অন্যায় ঘটে যায়। আর দুটি নিশাচর
জীব উভয়ের ঠোঁটে লাগা রক্ত জিভে মুছে নিয়ে
গাড়ির জানলা দিয়ে উড়ে যায় আরো অন্ধকারে
কোথায় যে এসময় বেজে ওঠে তোমার বেহালা—
রোমের ধ্বংস থেকে ১৯৮১, কবে এলে নিরো?

(নিরোর বেহালা/চল্লিশ চাঁদের আয়ু)

নিরোর বেহালা বাদনের প্রতীকে মল্লিকা ইতিহাসের যে ভুবনে পর্যটন করেন সেখানে কেবলই শোষণের ইতিহাস, নারীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে পুরুষ। এঙ্গেলস, ভার্জিনিয়া উলফ্, সিমোন দ্য বোভেয়ার, কেট মিলেট, হুদা শারাবীর লিখনবিশ্ব থেকে মল্লিকা জেনেছেন আমাদের সমাজে ছেলেরা চালাবে, আর মেয়েরা চলবে, এ যেন জন্মগত অধিকার।[৩] পুরুষ হলেন কর্তা, নারী তার ইচ্ছা পালনকারী দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ, বোভেয়ার যাকে বলেছেন 'দি সেকেণ্ড সেক্স'। চারপাশের দাউদাউ বর্তমানে এই ধারণা আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। তেইশ বছর বয়সে লেখা প্রথম কাব্য 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'তে মল্লিকার স্বর নারীবাদের তীব্রতা তেমনভাবে স্পর্শ করেনি। সে সময়ের মল্লিকার চোখে কিছু স্বপ্নঘোর কিছু আর্তি লেগে ছিল—সেই স্বপ্ন আর্তি থেকেই মল্লিকা লিখেছেন 'ঘর'কবিতায়—'বাঁশের মাচান বাঁধো সংগমের আগে, ঘর হবে/পুত্র

বেঁধে নেব পিঠে/নদী দৃশদ্বতী আজো বইছেসেখানে, পলি, নতুন উদ্ভিদ/বৈবস্বত পিতা আমাদের আশীর্বাদ করো এবারের শীতে/যেন যাযাবর হয়ে আর বেরিয়ে না পড়ি।' এই আর্তি ও স্বপ্ন অবশ্য খুব বেশি স্থায়ী হয়নি, তাঁর ১৪-টি কাব্য এবং গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত মিলিয়ে ৪৫৫-টি কবিতার পর্যালোচনায় দেখা যাবে মল্লিকা ক্রমাগত পুরুষ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর স্বর তীব্র করে তুলেছেন। মেয়েদেরকে নিজের সম্পত্তি ভাবা পুরুষতন্ত্রকে মল্লিকা আঘাত করেছেন; তবে এই আঘাত একান্তভাবেই সমানাধিকারের জন্য, মানুষ হিসাবে মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য, গ্রহণ করে ঋণী হওয়ার জন্য।

গ্রহণ করে ঋণী হওয়ার পক্ষে বড়ো বাধা পুরুষতন্ত্র। মল্লিকা তার স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'পুরুষশাসিত সমাজ মানে এই নয় যে প্রতিটি পুরুষই মেয়েদের শত্রু...নারীর শত্রু পুরুষ নয়, নারীর শত্রু নারীও নয়। আসল শত্রু পিতৃতন্ত্র নামে দর্শন ও তার নিজস্ব আচরণবিধি। পিতৃতন্ত্র বা পুরুষের শাসনব্যবস্থা পুরুষের মাথা থেকে বেরোলেও নারী ও পুরুষ উভয়েই তার ভিত্তি পাকা করেছে। সেই নারীরা বোঝেনি যে এই ব্যবস্থা তাদেরই বিরুদ্ধে সক্রিয়, এখনও অধিকাংশ মেয়ে তা বোঝে না। আবার যারা বোঝে তারা সকলেই মেয়ে নয়। বহু পুরুষ লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে'।[৪]মল্লিকার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মল্লিকার প্রতিবাদ পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ, এঙ্গেলস, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের নারীবাদী চিন্তনের কথা বলেছেন মল্লিকা। আসলে মল্লিকা খুব সচেতনভাবেই নারীর দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, উপেক্ষা, অপমান, শোষণের ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর ইচ্ছা এই ভাষ্য পৌঁছে যাক সভ্যতার অন্দরে আর তার থেকে জন্ম নিক নতুন বিশ্ব। সেই নতুন ভুবনে 'লিঙ্গসাম্যের ভিত্তিতে তৈরি হবে সমাজ, পুরুষেরা দৃপ্ত নতুন এক নারীকে ঘরে ও বাইরে পাশে পাবে, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে পিতার। শিশুরা একই মাত্রায় বাবা ও মায়ের সাহচর্য পাবে। বাবা তার কাছে কোনো দূরবর্তী ঈশ্বর হবেন না, হবেন মায়ের মতই আপনজন।'

আপনজন পুরুষের প্রেমে মল্লিকা ভাসতে চেয়েছেন বার বার। আর্তিতে, প্রেমে তাঁর ভেসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। 'সোহাগ শর্বরী'কাব্যের 'জাহাজডুবি'কবিতায় ভেসে যাওয়ার মধুর উদ্ভাসন প্রকাশ পেয়েছে 'আমি কি জানতাম সারাটা রাত ধরে অতটা যেতে পারে শৃঙ্গার/নরম একটুও হলো না অনুনয়ে, জাহাজে শুধু দোল লাগল/জাহাজ ভেসে গেল, জাহাজ ডুবে গেল, ওই তো মাথা কান শুশুকের/আমি তো শুধু তৃণ ছিলাম ফুসফুসে, আমি তো ভেসে যাব, ভাসবই'। মধুর ভেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতার পরেও মল্লিকা অনুভব করেন বিরূপ বিশ্বের পুরুষ-সর্বস্ব সামাজিক কাঠামো আচ্ছা করে কামড়ে ধরে নারী প্রগতির সকল উড্ডয়ন। ভূগোল ব্যাপ্ত সমকালের এই বিষাদ থেকে মল্লিকা হয়েওঠেন প্রতিবাদী, বলেন প্রতিরোধের কথা। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও স্বাধীন ইচ্ছার স্বরায়ণ গড়ে ওঠে মল্লিকার তৃতীয় কাব্য 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' থেকে।

ইতিহাসে যে স্বর চিরকাল উপেক্ষিত থেকেছে, পুরুষতন্ত্রের প্রথার নিগড় যার দু-পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়েছে, মল্লিকা সেই উপেক্ষিত শোষিত জীবনের প্রতিস্পর্ধী বয়ান রচনা করলেন তাঁর কাব্য-কবিতায়। অন্ধকার ঘনঘোরকে আর না বাড়িয়ে তিমিরবিলাস ছিন্ন করে মল্লিকার কবিতা উপস্থাপিত হলো তিমির বিনাশের প্রত্যয়ে—

আমার চোখে তার দু-চোখ বিঁধে গেল, সৃষ্টি থেমে গেল অকস্মাৎ
কৃষ্ণচূড়াগুলি আগুন জ্বেলে দিল মেঘেরা উড়ে গেল তৃণীর ছেড়ে
অলকনন্দার গাঢ় নীল জলে রক্ত মিশে হল বেগুনিঘোর
পুরুষটিকে আমি প্রণতি জানিয়ে বললাম, গোলাপগাছ,
তোমার কাঁটা আমি শরীর পেতে নেব শর্ত একটাই বলার আছে
আমার ইচ্ছায় কখনো বাধা দিলে জলের মাছ আমি ফিরব জলে।

(জলের মাছ/আমি সিন্ধুর মেয়ে)

নিজের ইচ্ছের এই ঘোষণা করেছেন মল্লিকা নম্রভাবে। তীব্র প্রতিবাদে সব ছারখার করে দিয়ে নয়, বরং উচ্চারণের গভীর ব্যঞ্জনায় তাঁর ইচ্ছা স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান লাভ করেছে। সকল কাঁটা শরীর পেতে নিতে চায় যে নারী, তার ইচ্ছা তো সকল কাঁটা ধন্য করে ফুল হয়ে ফুটে ওঠার। এই ইচ্ছাতেও বাধ সাধলে বিপ্রতীপ বয়ান উঠে আসা অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পূর্বকথায় মল্লিকা জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কবিতা, ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাসে বিলুপ্ত মেয়েদের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর নিজেরও হতে পারত। তাই দীর্ঘদিনের ইতিহাসে পুরুষের নির্মাণ নারীকে যখন সম্মান করে না, ভালোবাসে না কেবলই গ্রাস করতে চায়, তখন মল্লিকা তাদের সকলের হয়ে প্রতিবাদ করেন, প্রশ্ন করেন পুরুষতন্ত্রকে। 'আমি সিন্ধুর মেয়ে'কাব্যের 'রক্তচিহ্ন' কবিতায় মল্লিকা তুলে ধরেন ইতিহাসের জমে থাকা অন্ধকারকে, প্রশ্ন করেন শোষণ ও নির্যাতনের ক্রম চলমানতাকে—

প্রথম যেদিন সীমন্ত চিরে রক্তচিহ্ন দিয়েছ
আমার সেদিন ব্যথা লেগেছিল, বলিনি তোমাকে বলিনি
রুক্ষ মাটিতে ফোটে না গোলাপ ময়ূর পেখম তোলে না
তবু চিরদিন বালুচর খুঁড়ে পানীয় তুলেছি আমরা
ছেলে কোলে করে জোনাকি দেখেছি, চিনিয়েছি কালপুরুষ
আমরা তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিম পুরুষ
তবে কেন তুমি আমার দু-হাত শেকল পরিয়ে রেখেছ
হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?

হাজার বছরের অন্ধ ইতিহাসে কেবলই ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছে, নিরাময় ছিল না কোথাও, আরো আশ্চর্যের নারীদের দিক থেকে দু-একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ দেখা গেলেও অধিকাংশ সময়ে তারা অবিচারকে মেনে নিয়েছে কিংবা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মল্লিকা এই মেনে নেওয়ার কিংবা মেনে নিতে বাধ্য হওয়াকে পরম মমতায় দেখে তাদের হয়ে সমাজকে, বিশেষ করে পুরুষ দর্পিত সমাজকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। প্রশ্ন করে ভাঙতে চেয়েছেন দীর্ঘদিনের লালিত অচলায়তনের নিগাঢ়, খিড়কি আর সিংহদুয়ারের সীমা ছাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইছেন সূর্য, আলো, ঘাস, মাটি, বাতাস, জীবন।

অবরুদ্ধ অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসবার পথে ছিল পদে পদে বাধা। এই বাধা কেবল বাইরের ছিল না। নারীর নিজেরও ছিল হাজার রকমের বেড়ি। মল্লিকার কবিতা নারীর শৃঙ্খল মোচনের কথা তুলে ধরে কথামানবী মল্লিকার কলমে উঠে আসে বেদ পুরাণ থেকে বিপন্ন বর্তমানের প্রতিবাদী নারী চরিত্র— দ্রৌপদী, গঙ্গা, সুলতানা রাজিয়া, মাধ্বী, মেধা পাটেকর, মালতী মুদি, শাহবানু, খনা প্রমুখ। মল্লিকা দেখতে থাকেন এই সকল ভারতকন্যার পদচ্ছাপে অনেক রক্তচিহ্ন। তবু তাদের ক্রমিক যাত্রার মধ্যে থেকে উঠে আসে মুক্তির পথ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাঁ-মুখ, তীক্ষ্ণ দাঁত ও চোয়ালে যখন গিলে খেতে চায় নারীর সমস্ত একক স্বরায়ণ কবি মল্লিকা ইতিহাস থেকে তার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ খুঁজে পান, শিরদাঁড়া সোজা করেই তিনি চোখে চোখ রাখেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর কলমে পরপর গড়ে ওঠে 'হাঘরে ও দেবদাসী'র জীবনযন্ত্রণা, 'অর্ধেক পৃথিবী'র হাসি কান্না, 'মেয়েদের অ আ ক খ', 'কথামানবী'র ভাষ্য, 'দেওয়ালির রাত'-এর উত্তাপ, 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই'-এর বিপ্রতীপ দ্যোতনার কথামালা, 'পুরুষকে লেখা চিঠি'র 'রেডলাইট'আশঙ্কা। কবি মল্লিকা জীবন ছোঁয়ার অভিজ্ঞতা পান 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে', প্রবল আর্তিতে উচ্চারণ করেন 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালোবাসা', অভিমান থেকে লেখেন 'ও জানেমন জীবনানন্দ, বনলতা সেন লিখছি', মৌন বাঙ্ময়তায় লেখেন 'বৃষ্টি মিছিল বারুদ মিছিল'। নারীবাদ নয়, মানববাদের কথা সমানাধিকারের কথা তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয় পৌনঃপুনিকভবে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটেছে প্রধানত নারীকেন্দ্রিক চিন্তনকে কেন্দ্র করে। নারীকে দীর্ঘদিনের শোষণের ও শৃঙ্খলিত করে রাখবার পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নারীকে পুরুষতন্ত্রের চাহিদা অনুসারে তৈরির বিরুদ্ধে মল্লিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন কবিতার মধ্যে। 'হাঘরে ও দেবদাসী' কাব্যের 'মাছের চাবুক' শীর্ষক বিভিন্ন কবিতার মধ্যে নারীদের বিষাদ, যন্ত্রণা, ক্ষয়, নৈরাশ্য ব্যক্ত হয়েছে। প্রান্তিক নারীর বয়ান উঠে এসেছে 'রূপ', 'শ্রীপঞ্চমী গ্রাম',

'মাছের চাবুক: সামন্ত যুগ', 'মাছের চাবুক: মোগল হারেম', 'আম্রপালী'প্রভৃতি কবিতায়। আবার 'অর্ধেক পৃথিবী' কাব্যের 'পাণ্ডুর পুত্রাকাঙ্ক্ষা' 'কন্যাবর্ষে', কবিতায় নারী শিশুর প্রতি অবজ্ঞার; উপেক্ষার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়েছে। বস্তির মেয়ের অনিবার্য গন্তব্য গণিকালয় এমন বিষাদ ভাবনা থেকে লেখা হয়েছে 'চূড়া' কবিতাটি। পুঁজিবাদের নতুন ব্যাখ্যায় মল্লিকা সমাজের প্রতি প্রবল শ্লেষে বলেছেন—'পথ ছিল স্নেহ ছিল, পিতা আর মাতা/নিজস্ব ধান্দায় ব্যস্ত, বস্তি জাতিকা/বড়ো হতে হতে শেখে চতুরালি খেলা/শরীরে কুসুম এলে পুঁজি জমে ওঠে/ঠিকমত বিনিয়োগ করতে শিখলে/ওই পুঁজি এনে দেবে পর্বতের চূড়া/চিৎপুর হার্লেমে ইথিওপিয়ায়/যে নারীরা পুঁজিবাদ শিখেছে নতুন।' অন্যদেশের সঙ্গে এদেশের চিৎপুরের ভূখণ্ড জুড়ে যায় নারী শরীরের পুঁজিতে।

ফ্রয়েডের তাত্ত্বিকতার প্রতি মল্লিকা শ্লেষ করেন 'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি' কবিতায়—

পুরুষের দেহে এক বাড়তি প্রত্যঙ্গ
দিয়েছে শাশ্বত শক্তি, পৃথিবীর মালিকানা তাকে
ফ্রয়েডবাবুর মতে ওটি নেই বলে নারীহীনম্মন্য থাকে
পায়ের তলায় থেকে ঈর্ষা করে পৌরুষের প্রতি
(ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি/অর্ধেক পৃথিবী)

ফ্রয়েডের 'পেনিস এনভি' শব্দের প্রতি শুধু বিরাগ নয়, মল্লিকা দেখিয়েছেন এই বাড়তিটুকুর কারণে মেয়েদের লাঞ্ছিত হতে হয় পুরুষশাসিত সমাজে, ফ্রয়েডও এই তত্ত্বে লাঞ্ছিত করেছেন নারীদের। মল্লিকা তাই ফ্রয়েডকেও অভিযুক্ত করেছেন—'এই লিঙ্গ রাজনীতি আদি পুরুষের/ফ্রয়েড আপনি নিজে বাড়তির দলে বলে ধরেই নিলেন/মেয়েরা কমতি, তাই পুরুষের প্রতি তারা ঈর্ষাকাতর!' আত্মপরিচয়ে সম্পূর্ণা নারী মল্লিকা সামাজিক চৌহদ্দিতে দেখতে পান পুরুষের অহং আহত হলে নারীকে দেগে দেবার, ভ্রষ্ট বলবার সাবেকি ঘরানা এখনো সমান সচল। ঘরে বাইরে যেসব নারীরা সমান দক্ষতায় পুরুষের সঙ্গে নতুন পৃথিবী সৃজনের কাজ করছে, কী শুনতে হয় তাদের? মল্লিকা উত্তর দিচ্ছেন—

১. সংসারে নুড়ো জ্বেলে ওই মেয়ে রসাতলে যাবে
২. মেয়েগুলো ধরে ধরে ছেলেদের মারবে এবার
৩. জানি জানি
মেয়েরা এখন চায় যৌন-স্বেচ্ছাচার।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি 'অর্ধেক পৃথিবী' কবিতার। যে পরমতায় নারীকে গ্রহণ করবার কথা ছিল তা না করে আমরা কেবলই অবজ্ঞা, শ্লেষ, উপেক্ষা করে চলেছি। নারীও তাই বন্ধু হয়ে উঠতে পারছেনা, হয়ে উঠতে পারছেনা কর্মক্ষেত্রে সহযোদ্ধা। মল্লিকাকে তাই আক্ষেপ করতে শুনি শ্রমবিভাজন ও পুঁজিতত্ত্বের পিতামহ মার্কসের কাছে। 'অর্ধেক পৃথিবী'কাব্যের প্রথম কবিতা 'আপনি বলুন, মার্কস'-এ মল্লিকা খেদের সঙ্গে প্রশ্ন রেখেছেন—

গৃহশ্রমে মজুরি হয় না বলে মেয়েগুলি শুধু
ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে
আর কমরেড শুধু যার হাতে কাস্তে হাতুড়ি!
আপনাকে মানায় না এই অবিচার

কখনো বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণিহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?
(আপনি বলুন মার্কস/অর্ধেক পৃথিবী)

মেয়েদের চরিতার্থতা যে শুধুমাত্র পুরুষের সেবায় নয়, সন্তান পালনে নয় সে সত্য সমাজ আর কবে বুঝবে? নারীর পরিচয় তার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান ও আত্মমর্যাদায়, বিপ্লবীর ভাত রেঁধে কিংবা গৃহকর্মে নিপুণতার মধ্যে নারীত্বের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। গৃহশ্রমে মজুরির কথা তুলে মল্লিকা তাই অসংখ্য গৃহবধূর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলেছেন।

পুরুষতন্ত্রের পরিসর জুড়ে কেবলই প্রভু সাজার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। গৃহকর্ম সম্পন্ন করেন যাঁরা, তাঁদের সম্মানও খুব কম। তাই পুরুষের সহযোগী বা সহযোদ্ধা হওয়ার মতো পরিসর গড়ে ওঠে না। পুরুষ প্রেমের আড়ালে নিত্যনতুন মুগ্ধতার ছক খোঁজে। পৃথিবীর পুরুষ-ক্ষেত্রে মল্লিকাকে তাই প্রতিরোধের ভাষা শিখতে হয়। প্রণয়ের ছলে প্রেম প্রকাশ আসলে ছল মাত্র, আসল কথা দখলদারিত্ব, এই অনুভব থেকেই মল্লিকা লিখেছেন, 'প্রভু সাজার ইচ্ছে হল/প্রেমিক তুমি নও/ভালোবাসব আদর দেব/বন্ধু যদি হও'। পুরুষ পৃথিবী বন্ধু খোঁজে না অবশ্য, দাসী খোঁজে, সেবিকা খোঁজে। সমাজতত্ত্বের ছাত্রীর বয়ানে মল্লিকা 'কালশিটে' কবিতায় দেখিয়েছেন কীভাবে অব্যক্ত অক্ষরগুলি, বিবাহের গূঢ়তর দিক প্রকাশ পায় পিঠের কালো ক্ষতে— 'বিবাহের সেই সব গুঢ়তর দিক/ফুটে ওঠে ওর পিঠে কালো কালো গভীর অক্ষরে/ কালশিটেগুলি ভয়ে কেঁপে ওঠে অনাগত দিনের শঙ্কায়'— এই শঙ্কা থেকে উঠে আসে প্রতিরোধ, মল্লিকা সর্বজয়া মানবী হয়ে পুরুষের সব ছক ভেঙে দিতে চান, মাড়িয়ে দিতে চান। তিনি বোঝেন নারীর জন্য 'স্বভূমি'নির্মাণ কত জরুরি। এই স্বভূমি নির্মিত হলে, মল্লিকা স্বপ্ন দেখেন, পুত্র-কন্যার সমানাধিকারের— 'পুত্র এবং কন্যা/হাসবে কাঁদবে। সমানে সমানে দাঁড়িয়ে। আনন্দ গান গাইবে'।

আনন্দের সামগান গাইতে চাইলেও তার সুর বাজে না, সমানাধিকারের প্রশ্নে মল্লিকা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের স্বামীর ঘরে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিপ্রশ্ন তোলেন, 'দেওয়ালির রাত', কাব্যের 'আমার বাড়ি' কবিতাটি নারীজীবনের অমোঘ ট্রাজিডিকে নির্দেশ করে, ভেঙে দিতে চায় পুরুষতন্ত্রের চেনা ছক, কেননা স্বামীর ঘর, নারীর নিজের ঘর হয়ে ওঠে না, মল্লিকা তাই পুরুষকে আমন্ত্রণ জানান— 'আমায় কেন যেতেই হবে/তোমার বাড়ি ভাবছি তাই/না হয় তুমিই থাকতে এলে/আমার বাড়ি আমার ঠাঁই।' যন্ত্রণার উপলব্ধিতে কবি লক্ষ করেন দেশের নানাবিধ সংকটের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠছে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাওয়া। কন্যাভ্রূণ হত্যা তো ছিলই, ভাবতে ইচ্ছে করে মল্লিকা সম্মান রক্ষায় খুনের বিরুদ্ধে তীব্র স্বর তুলত। 'দেশ' কবিতায় তার প্রাথমিক ভাষ্য তো ছিলই—

দেশ আমার গ্রন্থসাব
দেশ আমার বাইবেলের
দেশ আমার মহাভারত
দেশ আমার ইসলামের।
তবুও দেশ সোনালি দেশ
টুকরো হয় চোখের জল
হিংসা বাড়ে গরিব বাড়ে
কমতে থাকে মেয়ের দল।
(দেশ/দেওয়ালিররাত)

শর্তবিহীন যে ভালোবাসা মল্লিকা পেতে চেয়েছিল, দিতে চেয়েছিল— সেই ভালোবাসা থেকেই মল্লিকার কবিতায় উঠে আসে নারীবিশ্বের অপমানিত, উপেক্ষিত বিষাদসিন্ধুর জীবনগাথা। সেই সঙ্গে মল্লিকা নির্দেশ করেন ভারতীয় নারীদের অর্থনৈতিক পরাধীনতার ক্ষেত্র। 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণে' নারীর স্বনির্ভরতা সম্পর্কে বলেছেন— প্রজন্মের পর প্রজন্ম, দিনের পর দিন, সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভর করতে করতে এদেশের অধিকাংশ মেয়ে ভুলেই গেছে যে তারাও মানুষ, পুরুষের সমান শিক্ষা ও সুযোগ পেলে; অলিঙ্গ বিদ্বেষী আবহাওয়ায় তারা প্রত্যেকেই তাদের ভাই বা স্বামীর মতো, বাবা বা ছেলের মতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হতে পারত। স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া যে নারীর পক্ষে খুব জরুরি, মল্লিকা তা নির্দেশ করেছেন সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে।

পুরাণ-ইতিহাসের পথ বেয়ে নারীও নারীত্বের সব অপমান ভারের বিরুদ্ধে মল্লিকার বিজয়-কেতন 'কথামানবী' কাব্যটি। মহাকাব্য ইতিহাসের গর্বিত সড়ক থেকে মল্লিকা চয়ন করেছেন সেইসব নারীদের যারা বিভিন্ন সময়ে শোষিত, অপমানিত হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে। কথামানবী হয়ে উঠেছে পুরুষতন্ত্রের আঙরাখা ছিন্ন করবার জেহাদি স্বরলিপি 'হ্যাঁ আমি কথামানবী। ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি। এই আগুন বেদনার, প্রতিবাদের, আত্মমর্যাদার, ভালোবাসারও। আগুন মরে গেলে মানুষ মরে যায়।' কোনো নস্ট্যালজিক বিষাদ নয়, মল্লিকা আগুন দিয়েই আগুনের ভাষ্য রচনা করলেন। এই অনন্য আগুনে আয়ুধ হয়ে উঠল—খনা, কুন্তী, সীতা, রূপ কানোয়ার, আনার কলি, মেধা পাটেকর, দ্রৌপদী, রূপান বাজাজ প্রমুখ। হস্তিনাপুর থেকে হাওড়ার দীর্ঘ পরিসর জুড়ে নারীর আর্তস্বরকে মল্লিকা অগ্নি আখরে রূপ দিলেন।দ্রৌপদীর বহুপতি তত্ত্বের বিপরীতে কর্ণের বহুগামিতা চিহ্নিত করে বললেন 'দ্রৌপদীজন্ম' কবিতায়—

আমি যদি বেশ্যা হই, তুমিও পুরুষ-বেশ্যা কর্ণ মহামতি।
তোমারও শয্যায় আসে বহু পত্নী, বিবিধ স্ত্রীলোক
তুমি যে নিয়মে চলো সে নিয়মে অধিকার আমারও থাকুক
তোমরা যে গ্রন্থ লেখ সেই গ্রন্থ আমরাও উলটে দিতে পারি

(দ্রৌপদীজন্ম/কথামানবী)

প্রতিপ্রশ্নের, প্রতিস্পর্ধার এই বয়ান মল্লিকার কবিতার বড়ো শক্তি বলে মনে হয়। সব মেনে নিয়ে নয়, প্রতিপ্রশ্নে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা বাংলা কবিতাভুবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। 'গাঁথাজন্ম', 'রিজিয়াজন্ম', 'মেধাজন্ম', 'মাধবীজন্ম', 'মালতীজন্ম', 'শাহবানুজন্ম', 'খনাজন্ম' প্রভৃতি কবিতায় নারীর আর্তস্বর ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী কণ্ঠ। জল্লাদের ভয়ানক আঘাতের পরেও তাই নারীর অধিকারের প্রশ্নে মল্লিকার কবিতা বেজে ওঠে জলতরঙ্গের মতো, খনার ছিন্ন জিহবা মাঠে পড়ে কাঁদে।

প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পাশে মল্লিকার কবিতার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য প্রেম-কামনার অলজ্জ উচ্চারণ। সিমোন দি বোভেয়ার নারীর কামসুখ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, নারীর কামসুখ এক ধরনের মোহিনী আবেশ, যদিও কোনো কথা বা নড়াচড়া স্পর্শাদরের সম্মোহনের বিপক্ষে যায়, তবে আবেশটি ভেঙে যায়। নারী চায় সমগ্র বিলীন করে দিতে পরিপার্শ্ব, প্রেমিক ও নিজের অনন্যতা। আরো বিশেষভাবে সে বিলীন করে দিতে চায় তার ও পুরুষটির মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্নতা, সে কামনা করে তার সাথে এক দেহে বিলীন হয়ে নতুন একত্বে প্রকাশিত হতে। মল্লিকা সেনগুপ্ত অকপটভাবেই নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ করেছেন কবিতায়। কামনার এই দীপ্ত উচ্চারণ, পুরুষ-কবিদের পাশে মল্লিকার উপস্থিতি প্রবলভাবে ঘোষণা করেছে। কবিতায় শারীরিকতা যে পুরুষদের মনোপলি নয়, মল্লিকা যেন নীরবে সে ঘোষণাও করে রাখলেন। তপোধীর ভট্টাচার্য মল্লিকার এই অবস্থান চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রতিবাদী বর্ণমালা: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা'প্রবন্ধে—"বাংলা কবিতায় পুরুষ কবিদের যৌন অনুষঙ্গ ও শরীরী তীব্রতার অজস্র বিবরণের কথা মনে রাখলে মল্লিকার ঐসব পঙ্‌ক্তিকে প্রতিবাদী বলেই ধরে নিতে পারি। কেননা কবি পুরুষের চোখে নিজের নিভৃততম অনুভূতিএ অভিজ্ঞতাকে দেখেননি কিংবা পুরুষের দ্বারা আরোপিত ভাষার মান্য প্রকরণকেও অনুসরণ করেননি।"[৪]

মল্লিকার কামনা-সংরাগের উজ্জ্বল উপস্থিতি 'সোহাগ-শর্বরী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় লক্ষ করা যায়। 'সোহাগ-শর্বরী', 'লোম', 'প্রোষিতভর্তৃকা', 'জাহাজডুবি', 'জাদুসংস্কার' প্রভৃতি কবিতায় নারীর অনুভব, কামনা তীব্রতা পেয়েছে। কাব্যের নামকবিতায় সংগমপূর্ব এক প্রত্ন ও লৌকিক আবেশ নির্মাণ করেছেন মল্লিকা— 'হংসদম্পতির আজ এইখানে সোহাগশবরী/চার হাত ভরে মাটি তুললাম, গাঁথা হল ভিত/তিরধনুকের চিহ্ন আঁকলাম মাটির দেয়ালে/দ্বীপ জন্ম নেবে আজ শ্বেত ও প্রবাল ঘূর্ণিস্রোতে'[৫]। মল্লিকার কামনা প্রকাশ পায় 'শত শরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও' কিংবা 'উরুর সীমানা অতিক্রম করে যে দেখেছে আরো/সে আমার স্বামী, তাকে প্রতারণা করতে পারি না' উচ্চারণের শারীরিকতায়।

কামনা সংরাগের গভীর নির্জনের একান্ত অনুভূতির, যৌনতার মধুর উপলব্ধি 'জাহাজডুবি'কবিতায় যেভাবে মল্লিকা প্রকাশ করলেন বাংলা কবিতায় নারীদের নির্মাণে তা বিরল। মধুর উপলব্ধির 'অলজ্জ' প্রকাশ মল্লিকার একান্ত নিজস্ব সৃজন—

পুরুষ শুয়েছিল ফেনায় দুধসাদা একটি বিছানায় বিহ্বল
আলোকস্তম্ভের আড়ালে ফুটেছিল শ্রেষ্ঠ ভাসমান কোষফল
আমি কি জানতাম সারাটা রাত ধরে অতটা যেতে পারে শৃঙ্গার!
নরম একটুও হল না অনুনয়ে, জাহাজে শুধু দোল লাগল
জাহাজ ভেসে গেল, জাহাজ ডুবে গেল, ওই তো মাথা কান শুশুকের
আমি তো শুধু তৃণ ছিলাম ফুসফুসে, আমি তো ভেসে যাব, ভাসবই।

(জাহাজডুবি/ সোহাগশর্বরী)

ভেসে যাবার এই মধুর ইচ্ছা অন্যরূপে প্রকাশ পেল 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' কাব্যের 'জম্বুদ্বীপের চাঁদ' কবিতায়। 'জম্বুদ্বীপের চাঁদ'বাংলা কবিতায় এক সাহসী উপস্থাপনা। নারী তার যৌনতা অনুভব করছে নিজের অনুভূতিতে, পুরুষের দৃষ্টিতে নয়। চাঁদের রূপকে কবি আহ্বান করছেন পুরুষকে তার যোনিতে প্রবেশ করবার জন্য। সাহসী উপস্থাপনার ব্যতিক্রমী ভাষ্য মল্লিকা তুলে ধরলেন এই কবিতায়—

জামের পাতার মতো আমার বদ্বীপ
জামের পাতার মতো নিথর সবুজ
অপেক্ষায় থাকে কবে সে আসবে কবে
চামড়ার ঢেউ সরে গেলে যে গম্বুজ
দেখা দেবে, জ্বালামুখ থেকে শতাব্দীর
সঞ্চিত গরম চাঁদ চুঁইয়ে নামবে
কবে সে আসবে? কবে মহাকাশ কালো
করে চাঁদ ঢুকে যাবে কৃষ্ণগহ্বরে?

(জম্বুদ্বীপের চাদ/আমি সিন্ধুর মেয়ে)

কৃষ্ণগহ্বরে চাঁদ প্রবেশ করবার উপলব্ধি কবি মল্লিকা পেতে চেয়েছেন স্নায়ুর প্রতিটি তন্ত্রীতে, অপেক্ষা করছেন সেই পরম ক্ষণের, কবে আসবে চাঁদ?

যৌনতার পরম আস্বাদের পাশে দেখে নেওয়া যাক কিছু তিতকুটে ব্যথার উপলব্ধি, যা নারীজীবনে পরম অভিজ্ঞতার পাশে চরম হয়ে দেখা দেয়। শালীনতার তাপ্পিমারা ধারণা বদলে যেতে থাকে, মল্লিকার 'অনার্যর তির'-এ রক্তাক্ত হয় সমকাল। প্রতি চৌমাথায় ভেনাসের জন্ম হতে থাকে, অভিশাপ গ্রস্ত হতে থাকি আমরা, পুড়ে যায় রেটিনা। সাম্প্রতিকের নারী লাঞ্ছনা উঠে আসে সীতার বয়ানে 'মধুমাস'কবিতায় 'এবার রাবণ আর ছাড়েনি আমায়/রেশম বস্ত্রের নীচে লাল ফুলে ওঠা ত্বক, দগদগে, অনুভূতিহীন/প্রগাঢ় শিমুল/কচি দূর্বা থেতো করে প্রলেপ লাগাই/গোপন বাইচ চলে রক্তে ও রতিতে।' সৃজন স্পর্শহীন, দুর্জনের পৃথিবী অন্ধকারে কালোকাপড় পরে থাকে। নষ্ট আমোদে নগর ছাড়িয়ে মফস্সলে গড়ে ওঠে গণিকালয়-মীনাবাজার। 'আম্রপালী'র ভাষ্যে মল্লিকা তুলে আনেন নষ্ট সময়ের চালচিত্র—

এই পুরুষ, এই প্রেমিক, বৈশালীর সুনাগরিকগণ
গণসভায় রায় দিয়েছে—
"আম্রপালী পরম নারী, নিয়তি তার নগরনটী হওয়া"
আম্রপালী পালিয়ে যায়, পেছনে তার সমাজ তাড়া করে
আম্রপালী বাঁচতে চায়, সমাজ চায় প্রমাণ লোপ হোক।

(আম্রপালী/হাঘরে ও দেবদাসী)

এই বৈশালী দূর ইতিহাসের কোনো নগর জনপদ নয়, বৈশালী বিরূপ বর্তমানের। পুরুষতন্ত্রের নির্মাণ। 'আম্রপালী'র ভাষ্য সত্যি হয়ে ওঠে পার্ক স্ট্রিটে, কামদুনিতে, বাঁকুড়ায়, রানাঘাটে।

নারীকে শুধু শরীরী দেখতে অভ্যস্ত পুরুষেরা কাব্যে ও জীবনে ভুলে যায় নারীর বুদ্ধিবৃত্তি, মন ও মনন। কালিদাস শকুন্তলার বর্ণনায় যে 'পীনবক্ষা ক্ষীণকটি সুমধ্যমা বিপুল নিতম্বী'নারীর রূপ বর্ণনা করেছিলেন, মল্লিকা দেখেছেন মহাকাব্য থেকে একুশ শতক পর্যন্ত সে ধারা প্রবহমান, নারীর যে মগজ আছে, মন আছে তা পুরুষ কবিরা ভুলে যায়। কর্মক্ষেত্রে যে নারী প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে, যে নারী ধান বুনছে, ইট দিয়ে গড়ে তুলছে ইমারত, তর্ক করছে, কবিতা লিখছে কবিরা যেন তাদের বর্ণনাযোগ্য শব্দ খুঁজে পান না। মল্লিকা তাই খেদের সঙ্গে কবির প্রতি বলেছেন 'অর্ধেক বুঝেছ তুমি মহাকবি, মেয়েদের অর্ধেক বোঝনি'। অর্ধেক না বোঝার অভিযোগে অভিযুক্ত হন পুরুষ কবিরা। শুধু কবিরাই-বা কেন, নারীকে তো সমাজও বোঝে না, আর সামাজিক নির্মাণ তো পুরুষেরই।

মল্লিকা জীবন-অনুভবে পক্ষপাতদুষ্ট নন। পুরুষ কবিরা নারীস্তুতি করেছে চিরকাল, করেছে রূপবর্ণনা আর বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে বার বার। ভালোবাসার নামে নারী বার বার শৃঙ্খলিত হয়েছে[৬]। মল্লিকা তার দর্শনে এবার কাব্যপুরুষকে নতুন সাজে সাজাতে চান, তার শরীরে সুগন্ধ সাবান হয়ে পর্যটন করতে চান, বিশ্বাস করেন কবিতা, পুরুষ কবির বাঁধা সম্পত্তি নয়। 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালোবাসা' কাব্যের 'কাব্যপুরুষ'কবিতায় মল্লিকা দাড়োর সঙ্গে ঘোষণা করেন— 'পুরুষ কবিরা যদি কবিতাকে ঘরে বেঁধে রাখে/পরম সম্পত্তি ভাবে, বাঁধা বউ ভাবে/বউ একদিন তার হাত থেকে পিছলে পালাবে'। সমভাবনার, সমবোধের আগুন মল্লিকা জ্বালিয়ে রাখতে চান অহর্নিশ জুড়ে। দেশান্তরের নারীর অপমান তার নিজের অপমান মনে হয়। আবার নারীর প্রতি ধর্মগুরু বা উলেমাদের ফতোয়া নেমে এলে মল্লিকা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ঘটে যাওয়া প্রবল অন্যায়ের প্রতিকার চান মানুষের কাছে, তাঁর উচ্চারণে অনেক সময়েই মিশে যায় রাগ-ক্ষোভ-দ্বেষ-ঘৃণা। আমাকে সারিয়ে দাও ভালোবাসা কাব্যের 'আমি ইমরানা' কবিতায় দার-উল-উলেমার ফতোয়ার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তাঁর জেহাদ—

দার-উল-উলম ফতোয়া দিলেন
শাস্তি হবে আমার
পুরুষের কাজ পুরুষ করেছে, করুক
এখন থেকে আমার ঘর ধর্ষকের খাটে—
বরের সঙ্গ এখন থেকে বারণ।
আমি কি এক মাংসটুকরো
আমদরবার বিচার করুন
শয়তান চেটেছে বলেই বরবাদ আমি
আমার ঘর, আমার খসম, সব বরবাদ?
এই কি আমার শান্তির দেশ ভারতবর্ষ?
আমি ইমরানা, আপনাদের জবাবচাই।

(আমি ইমরানা/আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা)

মল্লিকা প্রেমে-প্রতিবাদে ভালোবাসার জনকে পাশে চান। অন্যায়ের বিচার চান, প্রেমার্তিতে ভালোবাসার জনকে কাছে চান, তাঁর কামনা সংরাগ প্রকাশিত হতে চায় প্রিয় পুরুষকে কেন্দ্র করে। আবার কামনার তীব্র আততিতে তিনি কলহান্তরিকা নায়িকার আচরণ করেন— 'শরীর যদি ঘুমিয়ে থাকে শরীরে যদি জাগে/ইচ্ছেপাখি এলোপাথার ফুঁসতে থাকে রাগে/অন্য লোক ডাক পাঠায়, ফিরিয়ে দিই তাকে/তুমি তো আজও তেমন করে ডাকনি পরমাকে'।

নারীর ব্যথার ত্রিভুবনের মাঝে মল্লিকা অনুভব করেন সাধারণ মানুষের বেদনার্তি।বালেশ্বরে পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য এগারো হাজার লোক নির্বাসিত হলে মল্লিকা প্রতিবাদ করেন। পুরুলিয়ার জলহীন অযোধ্যা পাহাড়ের মানুষজনের জন্য রচিত হয় সমানুভূতির ভাষ্য 'পুরুলিয়ার মেয়েটি'। আইলার তাণ্ডবে, অশান্তির জঙ্গলমহলে, আমরা-ওরার বিভাজনে জারিনা-ইমরানার জীবনযন্ত্রণায় মল্লিকা মানবিক আর্তি নিয়ে সকলের পাশে থাকেন। সময়ের রক্তচিহ্ন ধারণ করে নিয়ে কথামানবী মল্লিকা শর্তহীন ভালোবাসা চান, ভালোবাসতে চান। সময়ের রক্তক্ষরণ উঠে আসে তাঁর 'দেওয়ালির রাত', 'শিকার এবং শিকারি', 'রেডলাইট নাচ', 'ফুলন দেবীর কথা', 'মালতীর গান'প্রভৃতি কবিতায়। মল্লিকা সেই আগুনমেয়ে, যে আততি নিয়ে জড়িয়ে আছে অর্ধেক আকাশ, অর্ধেক পৃথিবী, স্পর্শ করতে চাইছে বাকি অর্ধেক, আর দুইয়ে মিলিয়ে গড়ে তুলতে চাইছে সমগ্র ভুবন।

সূত্রনির্দেশ:

১. সরকার, সুবোধ, (সম্পা.), (২০১২), *মল্লিকা সেনগুপ্ত কবিতা সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪। (কবিতার উদ্ধৃতি এখান থেকে নেওয়া)
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, (সম্পা.), (২০১০), *দ্বিরালাপ সংগ্রহ-১*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪৬৯।
৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, (২০১২), *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৭।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, (২০০৭) *নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৯১।
৫. সরকার, সুবোধ, (সম্পা.), (২০১২), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।
৬. বোভেয়ার দ্য সিমোন, (২০১১), *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (অনুবাদ: কঙ্কর সিংহ), র‍্যাডিক্যাল, পৃ. ২৩।